বাংলা বাগধারা

প্রসঙ্গ ও প্রয়োগ

বিজয় কবিরাজ

পুনশ্চ

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় বিভিন্ন প্রবাদ প্রচলিত আছে। এই প্রবাদগুলির সৃষ্টি কতদিন পূর্বে হয়েছে কেউ জানে না। এগুলির আবির্ভাব-ই বা কেমন করে ঘটেছে, তার সন্ধানও কেউ রাখে না। তবে এই প্রবাদগুলিকে বিশ্লেষণ করলে এগুলি যে মানুষের বহুবর্ষের অভিজ্ঞতালব্ধ তা অনায়াসেই বোঝা যায়। কোনো প্রবাদ সৃষ্টির পশ্চাতে ইতিহাস আছে, কারো পশ্চাতে বা অন্ধবিশ্বাস আছে, কারো পশ্চাতে বা পৌরাণিকী কথা আছে, কারো পশ্চাতে বা বৈজ্ঞানিক কোনো তথ্য আছে। এই প্রবাদগুলির বৈচিত্র্য এবং ব্যাপ্তি, দুই-ই অনন্য-সাধারণ। আর এদের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির বৈচিত্র্যটিকেও ধরতে পারা যায়।

ভাষা তো কোনো অচেতন তত্ত্ব নয়। এ হচ্ছে একটি সামগ্রিক সংস্কৃতির প্রতিভূ। বিশেষ একটি সংস্কৃতির বৈচিত্র্য ভাষায় প্রতিফলিত হয়। আর ভাষাও তার বৈশিষ্ট্য দিয়ে সংস্কৃতির বৈচিত্র্যটিকে ফুটিয়ে তোলে। ভাষার মধ্যে যেমন বিভিন্ন গঠনশৈলী আছে, তেমনি আছে ভাবপ্রকাশের বিচিত্র পদ্ধতি। আর এই যে ভাষার রূপ এবং ভাব, এদের মধ্যে তো কোনো পার্থক্য নেই। ভাষার রূপ এবং ভাষার ভাব, এরা দুটি মিলেমিশে তো একাকার হয়ে আছে। ভাষাকে যেমন ভাব থেকে পৃথক্ করা যায় না, তেমনি ভাবকেও ভাষা থেকে স্বতন্ত্র করা যায় না। ভাষা সম্বন্ধে তাই বলতে হয়, — এ একদিকে যেমন সংস্কৃতির প্রতিনিধি-স্বরূপিণী তেমনি অন্যদিকে ভাবের সঙ্গে একাত্মক। এই যে ভাবের সঙ্গে একাত্মতা, এটা না থাকলে তো সংস্কৃতির রূপবৈচিত্র্যকে ভাষা প্রকাশ করতে পারত না!

সাধারণ ভাষা সম্বন্ধে যে কথা প্রযোজ্য, প্রবাদ সম্বন্ধে সে কথাই প্রযোজ্য। প্রবাদের প্রয়োগ কোথাও কোথাও ভাষার সাবলীলতায় গতিবেগ সঞ্চারিত

করে,— তার ভাব প্রকাশনের সামর্থ্যকে বাড়িয়ে দেয়। তাই তো প্রবাদের প্রয়োগে নিষ্ণাত না হলে ভাষার উপরে অধিকার সম্পূর্ণ হয় না। অথচ বাংলাভাষার অনেক প্রবাদের উৎসই এখনও কুহেলিকাচ্ছন্ন হয়ে আছে। এদের বিশ্লেষণে বা মর্মমূলে প্রবেশ করে নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করার চেষ্টা এখন পর্যন্ত দেখা যায় নি। আশার কথা, শ্রী বিজয় কবিরাজ সম্প্রতি তাঁর ' বাংলা বাগ্‌ধারা ঃ প্রসঙ্গ ও প্রয়োগ' শীর্ষক গ্রন্থ নিয়ে বঙ্গ সাহিত্যের মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন। বিভিন্ন অভিধান ও কোষগ্রন্থের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়, — পৌরাণিক কাহিনীর কল্পলোকে স্বচ্ছন্দ পদসঞ্চরণ, ইতিহাসের তথ্যে গভীর প্রবেশ, এ সমস্তগুলির সংমিশ্রণ শ্রী কবিরাজের মধ্যে ঘটেছে বলেই তিনি বাংলা প্রবাদ ও প্রবচনগুলির উৎস আবিষ্কার করতে পেরেছেন এবং তাদের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শ্রী বিজয় কবিরাজের এই প্রচেষ্টা অভিনন্দনের দাবি রাখে। বাংলা ভাষায় প্রচলিত অনেক প্রবাদই তো বিস্মৃতির অতলগহ্বরে হারিয়ে গেছে। এখনও যারা আছে, তাদের রক্ষা করতে পারলে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত বঙ্গ সংস্কৃতি যেভাবে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে গিয়ে বিকশিত হয়েছে তার একটা পরিচয় পাওয়া যাবে। এদিক দিয়ে বিচার করলে শ্রী বিজয় কবিরাজের এই উদ্যম বাংলা ভাষার রূপজিজ্ঞাসু পাঠকেরই নয়, — বঙ্গ সংস্কৃতির তত্ত্বজিজ্ঞাসু সহৃদয়েরও প্রশংসাধন্য হয়ে উঠবে।

আমি শ্রী বিজয় কবিরাজের এই উদ্যমকে অভিনন্দন জানাই এবং তাঁর 'বাংলা বাগ্‌ধারা ঃ প্রসঙ্গ ও প্রয়োগ'-কে বঙ্গসাহিত্যের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সানন্দে বরণ করি।

"মাতৃ মন্দির"
কলকাতা-৭৫

ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
৬.৯.২০০১

নিবেদন

সাহিত্যের নানা অঙ্গের মধ্যে বাগধারা এক বিশেষ অঙ্গ। সব সাহিত্যেই বাগধারাগুলি বিশেষ ভঙ্গিমায়, বিশেষ ধারায় প্রবাহিত হয়ে ভাষাকে ব্যঞ্জনাময় করে তোলে। বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে এর প্রয়োগ ভাষায় যেমন সুষমা আনে, তেমনি আনে অর্থবহতা, বোধগম্যতা। নানা উপমা, উপদেশ, রস সঞ্চার, সমস্যার সরলীকরণ বা ব্যাখ্যান বাগধারাগুলির দ্বারা সাধিত হয়। এর নিজস্ব গতিময়তা আছে, উচ্চারণভঙ্গী আছে এবং নির্দিষ্ট প্রয়োগ ক্ষেত্র আছে। যথাস্থানে, যথাসময়ে এবং যথার্থভাবে প্রয়োগ করলে বাগধারার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।

বাগধারা, প্রবাদ, প্রবচন — এদের নির্দিষ্ট ক্ষেত্র, সংজ্ঞা থাকলেও সাহিত্যে এরা প্রায় একাকার। ব্যাকরণগত বিশ্লেষণে যেটি প্রবাদ বা প্রবচন সেটিই সুন্দরভাবে কোথাও বাগধারা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাগধারার গুরুত্বপূর্ণ উপাদানই হ'ল এর প্রয়োগ পদ্ধতি এবং কথাটিকে বিশেষ ক্ষণে বিশেষ ভঙ্গীতে উপস্থাপিত করা। শহুরে শিষ্ট ভাষায় সাধারণ বাচনভঙ্গীতে প্রয়োগ করলে বাগধারা তার মাধুর্য হারায়। লক্ষ করে দেখেছি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এর কোনো ব্যতিক্রম নাই। পশ্চিমবঙ্গের এক প্রান্তিক জেলায় যে উদ্দেশ্যে বা ভঙ্গীতে বাগধারার ব্যবহার, মহারাষ্ট্রের বা উড়িষ্যার এক প্রান্তিক জেলায় একই উদ্দেশ্যে বা ভঙ্গিতে তার ব্যবহার। বাগধারা এক লোকভাষা। সভ্য, সংস্কৃত মানুষদের মুখে এর প্রয়োগ তেমন দেখা যায় না। নতুন প্রজন্মের কিশোর-কিশোরীদের অনেকের কাছে, বিশেষত যারা শহর সংস্কৃতির মধ্যে লালিত, বাগধারাগুলি তাদের কাছে অশ্রুতপূর্ব। গ্রামীণ বৃদ্ধ বা শহরের আদি বাসিন্দা কিছু কিছু বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মুখে সাহিত্যের এই বিশেষ বাক্‌রীতি এখনো প্রবাহিত। তবে বাণিজ্যিক প্রয়োজনের স্বার্থে

এবং স্বাভাবিক বিবর্তনে ভাষার পরিবর্তন যে ভাবে ঘটছে তাতে বাগধারাগুলির অচিরেই হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। আধুনিক মানুষের 'দ্রুত জীবনে' মানুষ যেখানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো কথা বলতে চায় না সেখানে মানুষ কোন্ স্বার্থে কথার মাঝে বাগধারা ব্যবহার করবে? বস্তুত বাগধারাগুলি কথার মাঝে বাড়তি কথা।

লোকের মুখে মুখে যে বাগধারাগুলির সঞ্চার সেগুলিকে একত্রিক করে লিপিবদ্ধ করার কৃতিত্ব তিনজন ব্যক্তির — দুই ইংরেজ এবং এক বাঙালি — উইলিয়ম মর্টন, রেভারেন্ড জেম্‌স্ লঙ এবং ডঃ সুশীলকুমার দে। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টায় কয়েক সহস্র বাগধারা, প্রবাদ, প্রবচন সংগৃহীত হয়েছে। তাঁদের এই সংগ্রহের ফলে সাহিত্যের এই মণি-মুক্তাগুলি অবশ্যম্ভাবী বিস্মরণের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

যে বাগধারাগুলি নিয়ে আমাদের এত গর্ববোধ সেই বাগধারাগুলির উৎস বা প্রসঙ্গ নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা চোখে পড়ে না। অথচ এ বিষয়ে মানুষের কৌতূহলের সীমা নাই। অগণিত বাংলা বাগধারার সবগুলিই আপন আপন বৈশিষ্ট্য এবং সুষমায় সমৃদ্ধ। তাদের মধ্য থেকে আমি একমুষ্টি বাগধারা বেছে নিয়েছি যেগুলি বহুল প্রচলিত এবং পরিচিত এবং তাদের প্রসঙ্গ এবং উৎসক্ষেত্র নিরূপণের চেষ্টা করেছি। এই নিরূপণ কতখানি যথার্থ বা সঠিক হয়েছে সে বিষয়ে আমি নিজেকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখি না বা এ বিষয়ে আমার জ্ঞানের সীমাও যে অপরিসর তা স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠা বোধ করি না। সুতরাং কোনো সুধীজন যদি প্রসঙ্গ ও উৎস বিষয়ে প্রকৃত নির্দেশ দেন আমি শ্রদ্ধার সাথে তা গ্রহণ করব।

প্রতিটি বাগধারায় দুটি ক'রে অনুচ্ছেদ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম অনুচ্ছেদে প্রসঙ্গ এবং কখনো কখনো শব্দার্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে প্রয়োগ দেখানো রয়েছে। প্রয়োগ দেখাতে গিয়ে ভাব পরিস্ফুট করার জন্য একাধিক বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে, এতে যে সংক্ষিপ্ততার হানি ঘটেছে তা স্বীকার করি। প্রসঙ্গ ব্যাখ্যাকালীন তুলনীয় বাগধারার উল্লেখ করেছি। তুলনীয় বাগধারাগুলি কিন্তু সব সময় সমার্থক বাগধারা নয়। ভাবের কিঞ্চিৎ মিল আছে, এইমাত্র।

প্রসঙ্গ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যেমন প্রামাণিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, তেমনি অনেকক্ষেত্রে লৌকিক গল্প, কিংবদন্তি বা বাগধারা ব্যবহারকারীর সাথে সাক্ষাৎ আলোচনার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

লক্ষ করলে দেখা যায় একই বাগধারা বিভিন্ন এলাকায় শব্দগত পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছে, যদিও ভাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি। খনার বচন, চাণক্য শ্লোক, সংস্কৃত ভাষার বিভিন্ন প্রকীর্ণ শ্লোকগুলি অঞ্চল ভেদে দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে পরিবর্তিত। আবার একই রূপে প্রচলিত হলেও একই বাগধারা দুটি এলাকায় দুটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। যথাস্থানে তার উল্লেখ আছে।

বাগধারার ব্যবহার নিয়ে একটা প্রশ্ন অনেকেই তোলেন, সেটা হল যে অনেক বাগধারাই বর্তমান যুগে তাদের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। প্রশ্নটি অমূলক নয়। তবে প্রাসঙ্গিকতা এক কালে ছিল বলেই তার ব্যবহার ছিল। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এখনো আছে। যেমন, খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হল এঁড়ে গোরু কিনে; আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া ইত্যাদি। এখন স্ববৃত্তি ত্যাগ করে অন্য বৃত্তি গ্রহণ বহু ক্ষেত্রেই লাভজনক। চাঁদে গিয়ে সেখানে বেড়ানো এখন আর কল্পলোকের কথা নয়।

বিরুদ্ধ বাগধারারও উল্লেখ করা যেতে পারে যেগুলি পরস্পরবিরোধী। বিশেষ কালে এবং প্রসঙ্গে এদের উদ্ভব। কালক্রমে এদেরকে পরস্পরবিরোধী বলে মনে হয়। যেমন, বাহাত্তুরে যাওয়া এবং তিন মাথা যার, বুদ্ধি নেবে তার। নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো এবং দুষ্ট গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। এদের ভাবের মধ্যে বিরোধিতা আছে। কিন্তু যে যে প্রসঙ্গে বাহাত্তুরে যাওয়া বাগধারাটির বা তিন মাথা যার বুদ্ধি নেবে তার বাগধারাটির উদ্ভব সেই প্রসঙ্গগুলিতে কোনো বিরোধিতা নাই। তেমনি নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো এবং দুষ্ট গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো — এদেরও প্রসঙ্গের মধ্যে কোনো ভুল নাই।

বইখানি রচনার সময় ডঃ সুশীলকুমার দে-র 'বাংলা প্রবাদ' (তৃতীয় সংস্করণ, সম্পাদক ভবতোষ দত্ত ও তুষার চট্টোপাধ্যায়) রাজশেখর বসুর চলন্তিকা, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষ বই তিনখানির সাহায্য

নিয়েছি। আর সাহায্য নিয়েছি বাগধারা ব্যবহারকারী অগণিত লোকজনের কাছ থেকে। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বাগধারাগুলি বর্ণানুক্রমিক সাজিয়ে দিয়েছে আমার কনিষ্ঠা কন্যা স্নিগ্ধা কবিরাজ। কৃতজ্ঞতা জানানোর পরিবর্তে তার মঙ্গল কামনা করি। কনিষ্ঠপুত্র সুমন কবিরাজ বর্তমানে কলিকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট ও ক্র্যাফট্ কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। বইখানির প্রচ্ছদ অঙ্কন তার। যে সমস্ত সুধীজন আমার এই কাজে প্রেরণা যুগিয়েছেন, বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন ময়ূরাক্ষী গ্রামীণ ব্যাঙ্কের অফিসার শ্রীযুক্ত নিতাই দাস, সিউড়ি বেণীমাধব ইনস্টিটিউশনের প্রাক্তন শিক্ষক শ্রীযুক্ত পার্বতীশংকর ভট্টাচার্য এম.এ, সিউড়ি রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের শিক্ষক শ্রীযুক্ত সরিৎ চৌধুরী এম.এ, সিউড়ি, বিদ্যাসাগর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ অধিকারী, এম. এ. মহাশয়গণ। তাঁদের কাছে আমি ঋণী।

সর্বোপরি জানাই, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শ্রদ্ধেয় ড. রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ডি. লিট মহাশয় পরম স্নেহে যে ভূমিকাটি রচনা করে দিয়েছেন সেটি নিজ গৌরবেই বইখানির এক পরম সম্পদ। তাঁর এই করুণার জন্য আমি কৃতজ্ঞ, না বাধিত তা জানানোর ভাষা আমার জানা নাই।

বানানের ক্ষেত্রে আকাদেমি বানান অভিধান যথাসম্ভব অনুসৃত হয়েছে।

"কৃষ্ণকৃপা"
সিউড়ি, বীরভূম

বিনীত
বিজয় কবিরাজ

সূচীপত্র

অ

অকাল কুষ্মাণ্ড ৪৩
অকূল পাথারে পড়া ৪৩
অকূলে কূল পাওয়া ৪৩
অক্কা পাওয়া ৪৩
অক্ষরে অক্ষরে ৪৩
অগস্ত্য যাত্রা ৪৪
অগ্নিপরীক্ষা ৪৪
অগ্নিশর্মা ৪৪
অতি চতুরের ভাত নাই,
অতি রূপসীর ভাতার নাই ৪৪
অতি দর্পে হতা লঙ্কা ৪৫
অতি বড়ো হোয়ো না,
ঝড়ে ভেঙে যাবে
অতি ছোটো হোয়ো না,
ছাগলে মুড়ে খাবে ৪৫
অতি বড়ো ঘরনি পায় না ঘর,
অতি বড়ো রূপসী পায়না বর ৪৫
অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি ৪৬
অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ ৪৬
অতি ভালোও ভালো নয় ৪৬
অতি লোভে তাঁতি নষ্ট ৪৬
অথৈ জলে পড়া ৪৭
অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণ ৪৭
অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট ৪৭
অধিকন্তু ন দোষায় ৪৭
অনভ্যাসের ফোঁটা
কপাল চড়চড় করে ৪৮
অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া ৪৮
অন্ধের কীবা রাত্রি, কীবা দিন ৪৮
অন্ধের নড়ি কৃপণের কড়ি ৪৮
অন্ধের যষ্টি ৪৯
অন্ধের হস্তীদর্শন ৪৯
অন্নচিন্তা চমৎকারা ৪৯
অন্নপ্রাশনের ভাত উঠা ৪৯
অন্যে পরে কা কথা ৫০
অবোধের গোবধে আনন্দ ৫০
অভাগা যে দিকে চায়
সাগর শুকায়ে যায় ৫০
অভাবে স্বভাব নষ্ট ৫০
অমাবস্যার চাঁদ ৫১
অমাবস্যায় চাঁদের উদয় ৫১
অমৃতে অরুচি ৫১
অরণ্যে দিশেহারা ৫১

অরণ্যে রোদন ৫১
অর্ধচন্দ্র দেওয়া ৫২
অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী ৫২
অশ্বডিম্ব ৫২
অষ্টরম্ভা ৫২
অহিনকুল সম্বন্ধ ৫২

আ

আকাঁড়া চালের দোকান ৫৩
আকামে বউড়ি দড় ৫৩
আকাশ কুসুম ৫৩
আকাশ থেকে পড়া ৫৩
আকাশ পাতাল তফাত ৫৩
আকাশ পাতাল তোলপাড় করা ৫৪
আকাশ পাতাল ভাবা ৫৪
আকাশ ভেঙে পড়া ৫৪
আকাশে থুতু ফেললে ফিরে গায়েই লাগে ৫৪
আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া ৫৪
আকিলা বলে ভুঁইয়েই দে ৫৪
আক্কেল গুড়ুম ৫৫
আক্কেল সেলামি ৫৫
আগুন খেলে আঙার হাগতে হয় ৫৫
আগুন নিয়ে খেলা ৫৫
আগুনে হাত দিলে ছ্যাঁকা লাগবেই ৫৬
আগে তেতো, পরে মিঠো ৫৬
আগে দর্শনধারী, পরে গুণবিচারি ৫৬
আঙুল ফুলে কলাগাছ ৫৬
আঁচানো বন্ধ ৫৭
আচারে লক্ষ্মী, বিচারে পণ্ডিত ৫৭
আজ খেয়ে ন্যাড়া নাচে, কালকে গোবিন্দ আছে ৫৭
আটঘাট বাঁধা ৫৭
আঠারো মাসে বছর ৫৭
আতুরে নিয়মো নাস্তি ৫৮
আঁতে ঘা দেওয়া ৫৮
আত্মানং সততং রক্ষেৎ ৫৮
আত্মারাম খাঁচাছাড়া ৫৮
আদা খেয়ে আদার গেঁড়োয় ঠেক ৫৯
আদাজল খেয়ে লাগা ৫৯
আদা থেঁতলা করা ৫৯
আদাড় গাঁয়ে শেয়াল রাজা ৫৯
আদায় কাঁচকলায় ৫৯
আদার ব্যাপারি ৫৯
আধা মাঘে কম্বল কাঁধে ৬০
আপ ভালো তো জগৎ ভালো ৬০
আপ রুচি খানা, পর রুচি পরনা (পড়না) ৬০
আপন ঘরে সবাই রাজা ৬০
আপন ভজনকথা না কহিবে যথাতথা ৬১
আপন হাতে সবাই সাড়ে তিন হাত ৬১

আপনা ছিদ্র না জানিস,
পরকে দিস খোঁটা ৬১
আপনা হাত জগন্নাথ
পরের হাত এঁটো পাত ৬১
আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখাও ৬১
আপনি বাঁচলে বাপের নাম ৬২
আব আর আঁচিল কেটে
বাদ দেওয়া যায় না ৬২
আমড়াকাঠের ঢেঁকি ৬২
আমড়াগাছি করা ৬২
আমড়াগাছে আম ধরে না ৬৩
আমড়ার আঁটি চোষা ৬৩
আমতা আমতা করা ৬৩
আয় বুঝে ব্যয় করা ৬৩
আলালের ঘরের দুলাল ৬৩
আশায় খাটে চাষা ৬৩
আষাঢ়ে গল্প ৬৪
আসন, বাসন, গা,
তিন বাজাবে না ৬৪
আসি যাই মাইনে পাই,
কাজ করতে পয়সা চাই ৬৪
আহ্লাদে আটখানা ৬৪

ই

ইঙ্গিতে পণ্ডিত বোঝে, মূর্খ
বোঝে কিলে ৬৪
ইঁচড়ে পাকা ৬৫
ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় ৬৫
ইটটি মারলে পাটকেলটি
খেতে হয় ৬৫
ইতর বিশেষ ৬৫
ইতি গজ ৬৬
ইঁদুরে কপাল ৬৬
ইলশেগুঁড়ি ৬৬
ইষ্টনাম জপা ৬৬
ইদের (ঈদের) চাঁদ ৬৬

উ

উঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে ৬৭
উঠন্তি মুলো পত্তনেই
চেনা যায় ৬৭
উঠলো বায়,
তো মক্কা যায় ৬৭
উঠিয়ে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া ৬৭
উড়নচণ্ডী ৬৭
উড়ে এসে জুড়ে বসা ৬৮
উড়ো কথা ৬৮
উড়ো চিঠি ৬৮
উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ ৬৮
উত্তম মধ্যম দেওয়া ৬৮
উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে ৬৯
উনিশ বিশ ৬৯
উপরওয়ালার আগে,
আর ঘোড়ার পিছনে

অ

☐ **অকাল কুষ্মাণ্ড** *(আদুরে অকর্মণ্য ব্যক্তি)* — কুষ্মাণ্ড= চালকুমড়া। কুষ্মাণ্ডের ন্যূনতম কাল পূর্ণ না হলে অর্থাৎ বোঁটার দিকে চুন বা খড়ি না পড়লে তা খাবার যোগ্য হয় না এবং পূজার বলিতেও দেওয়া যায় না। সেই অর্থে অকাল কুষ্মাণ্ড ব্যবহারের অযোগ্য বস্তু। দ্বিতীয়ত: কুষ্মাণ্ড বর্ষা ও শরতের ফসল। কিন্তু কখনো কখনো হেমন্তের শিশির পড়া আরম্ভ হলে পুরনো গাছে পাশলতা বেরিয়ে তাতে কুষ্মাণ্ড ফলতে দেখা যায়। এরূপ কুষ্মাণ্ডকেও অকাল কুষ্মাণ্ড বলা হয়। তাই বুড়ো বয়সের সন্তানকে অকাল কুষ্মাণ্ড বলে। এরূপ সন্তান আদুরে ও নিষ্কর্মা। তুঃ- লেহর জালি।

শুভঙ্কর পঞ্চতীর্থ অকাল কুষ্মাণ্ড ছেলেটিকে নিয়ে বড়োই বিপাকে পড়েছেন।

☐ **অকূল পাথারে পড়া** *(সহায়হীন অবস্থায় পড়া)* — পাথার = সমুদ্র। কূলহীন সমুদ্রে পড়লে সাহায্যের কেউ থাকে না। অবস্থাটি খুব সংকটজনক।

মা, বাবা, দাদু কেউ নাই তার সংসারে। ছেলেটি পড়েছে এখন অকূল পাথারে।

☐ **অকূলে কূল পাওয়া** *(অসহায় অবস্থায় সহায় পাওয়া)* — অকূল দরিয়ায় তরীহীন অবস্থায় পড়লে সেখান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন। সেই অবস্থায় যদি হঠাৎ কূল পাওয়া যায় তাহলে মানুষ তাকে অবলম্বন করে নতুন ভাবে বাঁচার চেষ্টা করে।

কর্তার মৃত্যুর পর একমাত্র ছেলে যখন চাকুরিটা পেল তখন নিরন্ন পরিবারটি সত্যিই অকূলে কূল পেল।

☐ **অক্কা পাওয়া** *(মারা যাওয়া)* — অক্কা শব্দটি দেশি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ জ্যেষ্ঠা ভগিনী, বয়স্কা নারী ইত্যাদি। মরণের সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ নাই। তবে বৈষ্ণব জগতে যেমন মরণকে কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাথে তুলনা করা হয় তেমনি হয়তো শাক্ত জগতে মরণকে অক্কা অর্থাৎ বয়স্কা নারী অর্থাৎ মা কে (শক্তিরূপিণী মাকে) পাওয়ার সাথে এক করে দেখা হয়।

সাবলদহের সুবলবাবু এত সবলদেহী হয়েও হঠাৎ ক্যানসারে অক্কা পেলেন।

☐ **অক্ষরে অক্ষরে** *(অবিকৃতভাবে)* — লিখিত বা মৌখিক যে নির্দেশই থাক না কেন তার কোনোরূপ পরিবর্তন, সংস্কার, সংযোজন বা বিয়োজন না করা। যা লিখিত আছে তার প্রতিটি অক্ষর অবিকৃত রাখা।

গুরুজনবাক্য অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলাই ভালো। কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনা করে তার সামান্য সংশোধন ঘটালে ভাগবত অশুদ্ধ হয়না, বুঝলে!

☐ **অগস্ত্য যাত্রা** *(চিরবিদায়)* — গর্বিত বিন্ধ্য পর্বত নিজের শির উন্নত করে সূর্যের যাতায়াত স্তব্ধ করে। সূর্যের উদয়াস্ত বন্ধ হয়। দেবতাদের দ্বারা অনুরুদ্ধ বিন্ধ্যের গুরু অগস্ত্য মুনি শিষ্য বিন্ধ্যসমীপে গেলে বিন্ধ্য পর্বত প্রণত হয়। গুরু তখন শিষ্যকে আদেশ দেন যতদিন তিনি দক্ষিণ দেশ থেকে না প্রত্যাবর্তন করেন ততদিন বিন্ধ্য যেন এরূপ প্রণত অবস্থায় থাকে। অগস্ত্য আর প্রত্যাবর্তন করেন নি। বিন্ধ্য পর্বতও শির উন্নত করার সুযোগ পায়নি। সূর্যের আকাশ পরিক্রমা পুনরায় আরম্ভ হয়।

অচেনা ছেলেটাকে একশো টাকার নোট দিয়ে চা আনতে পাঠালে। একঘণ্টা হয়ে গেল, এখনও তো ফিরল না। অগস্ত্য যাত্রা করল না তো!

☐ **অগ্নিপরীক্ষা** *(কঠিন পরীক্ষা)* — সীতাকে সতীত্ব প্রমাণের জন্য অগ্নি-পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। পরীক্ষার শর্ত ছিল স্বামীসঙ্গহীন সীতার লঙ্কাবাস যদি তাঁকে কোনোভাবে কলুষিত করে না থাকে তাহলে অগ্নি তাঁকে দগ্ধ করবে না। এই ধরনের পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন।

পঞ্চায়েতের ভোটে একদিকে পুরনো প্রধান, অন্যদিকে আসন ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য নতুন দলের নতুন প্রার্থী। দুজনেরই আজ অগ্নিপরীক্ষা।

☐ **অগ্নিশর্মা** *(চরম ক্রোধী)* — ব্রাহ্মণদের উপাধি শর্মা। অব্রাহ্মণদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে এসে পাওনা-গণ্ডায় ত্রুটি দেখলেই কোনো কোনো ব্রাহ্মণ ক্রোধে আগুনের মতো জ্বলে উঠতেন এবং শাপশাপান্ত করতেন। এরূপ ব্রাহ্মণদেরকে অগ্নিশর্মা বলা হত।

তুমি তো বাবা বেশ ঠাণ্ডা ছেলে ছিলে। এখন বর্মা থেকে ফিরে এসে সব ব্যাপারেই অগ্নিশর্মা হয়ে উঠছ, দেখছি!

☐ **অতি চতুরের ভাত নাই, অতি রূপসির ভাতার নাই** *(অতি চতুর অবিশ্বস্ত হওয়ার ফলে তার অন্নসংস্থান হয় না, অতি রূপসী যোগ্য পাত্র নির্বাচন করতে পারে না বলে তার বর জোটে না)* — অতি চতুরকে কেউ বিশ্বাস করে না, কর্মে নিয়োগ করে না, সকল কাজে তার চতুরালি। সবাই তার সংস্পর্শ পরিহার করে চলে। ফলে তার অন্ন সংস্থান বিঘ্নিত হয়। অতি রূপসী সাধারণ পাত্র পছন্দ করে না। অসাধারণ পাত্র নির্বাচন করতে করতে তার বয়স পার হয়ে যায়। শেষে, হয় অযোগ্যকে বিবাহ করে নতুবা অবিবাহিতাই থেকে যায়। তু: ১) অতি বড় ঘরনি পায়না ঘর, অতি বড় রূপসি পায় না বর। ২) অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি।

(১) বাদল দত্তর ছেলেটা বেশ চটপটে। হিসাব-নিকাশও জানে। কিন্তু বড়োই তার চতুরালি। তাই কোনো মালিকই ওকে দোকানে লাগাতে চায় না। তাই তো বলে, অতি চতুরের ভাত নাই, অতি রূপসির ভাতার নাই।

(২) সবাই ভেবেছিল অনন্ত ঠাকুরের ছোটো মেয়েটির যা রূপ তাতে বিনা পয়সায় ভালো পাত্রের সাথে ওর বিয়ে হবে। কিন্তু মেয়েটি বলেছে ওর মনের মতো পাত্র ছাড়া ও বিয়ে করবে না। কিন্তু মনের মতো পাত্র আর জুটল না।

কথায় আছে, অতি চতুরের ভাত নাই, অতি রূপসির ভাতার নাই।

☐ **অতি দর্পে হতা লঙ্কা** *(অতি অহংকার ধ্বংস আনে)* — ক্ষমতার অহংকারে দর্পী রাবণ কখনো কারো সদুপদেশ গ্রহণ করেননি। গর্বান্ধ রাবণ তাই স্বর্ণলঙ্কার পতনের কারণ হয়েছিলেন। মূল শ্লোকটি হল —

অতি দর্পে হতা লঙ্কা, অতি মানে চ কৌরবাঃ
অতি দানে বলির্বদ্ধঃ সর্বমত্যন্ত গর্হিতম্।

কোনো কিছুরই বাড়াবাড়ি ভালো নয়। তু: ১) Pride goeth before destruction. ২) Too much of a good thing is good for nothing.

অতিদর্পে হতা লঙ্কা জানতো? তাই বলি, এত অহংকার ভালো নয়। একটু সামলে চল। তা না হলে পতন আসতে বেশি দেরি হবে না।

☐ **অতি বড়ো হোয়ো না, ঝড়ে ভেঙে যাবে,**
অতি ছোটো হোয়ো না, ছাগলে মুড়ে খাবে। *(অতি বড়ো বা অতি ছোটো, অতি দর্পী বা অতি বিনয়ী কোনোটাই হওয়া উচিত নয়)* — গাছ খুব বড়ো হলে ঝড়ের বেগ তার গায়েই লাগে। ফলে তার ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গাছ যদি খুব নিচু হয় তাহলে গবাদি পশু তাকে মুড়ো করে খেয়ে ফেলে। গাছ মাঝারি হলে এ দুটো সম্ভাবনার কোনোটিই থাকে না। মনুষ্য জীবনেও এটা ঘটে।

হাবলার খুব বাড় বেড়েছিল, খুন হল অন্ধকারে। আবার, গোবেচারা গফুর! মুখ ফুটে কথা বলল না বলে ধরে নিয়ে গেল পুলিশে। তাই কথায় বলে —

অতি বড়ো হোয়ো না, ঝড়ে ভেঙে যাবে,
অতি ছোটো হোয়ো না, ছাগলে মুড়ে খাবে।

☐ **অতি বড়ো ঘরনি পায়না ঘর**
অতি বড়ো রূপসি পায়না বর *(যোগ্যের সাথে যোগ্যের মিলন সব সময় ঘটে না। যে যা চায় সে তা সব সময় পায় না)* — ঘরকন্নায় পটু মহিলার ঠিকমতো ঘর সংসার মেলে না। অতিরূপসি কন্যার সব সময় রূপবান পাত্র জোটে না। তু: —

অতি চালাকের ভাত নাই
অতি রূপসির ভাতার নাই।

অর্থাভাবে নিশিনাথবাবু তাঁর অমন সুন্দর মেয়েটির বিয়ে দিলেন এক কাক অবতারের সঙ্গে। আবার, সংসারের সব-কাজ-জানা মেয়েটির বিয়ে দিলেন এমন এক পাত্রের সঙ্গে যাদের না আছে ঘরবাড়ি, না আছে জমি-জমা। কথায় বলে না — অতি বড়ো ঘরনি পায় না ঘর অতি বড়ো রূপসি পায় না বর।

☐ **অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি** *(বেশি চালাকি ক্ষতির কারণ)* — অতি বুদ্ধি = বুদ্ধির আতিশয্য যার সে। বুদ্ধির প্রয়োগ যেমন সাফল্যকে ত্বরান্বিত করে, তেমনি অতিবুদ্ধি অর্থাৎ চালাকি সাফল্যের পরিবর্তে ব্যর্থতা আনে। চালাকির দ্বারা মহৎ কর্ম হয় না। তু: ১) Too much cunning over reaches itself, ২) যত চতুর তত ফতুর। তাই চালাক লোকের জীবন ব্যর্থ হয়।

অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি, বুঝলে হরিপদ। সব ব্যাপারে তোমার বুদ্ধির প্যাঁচ খাটানোর জন্য তোমার কোনো কাজটাই সফল হয় না।

☐ **অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ** *(ভক্তির বাড়াবাড়ি যার বুঝতে হবে তার মতলব ভালো নয়)* — স্বরূপ লুকানোর জন্য মানুষ ভক্তির অভিনয় করে অপরকে অভিভূত করে, যাতে করে ভেতরের মতলব অপরে বুঝতে না পারে। অভিনীত ভক্তি প্রকৃত ভক্তি অপেক্ষা দৃশ্যত বেশিই হয়। এরূপ ভক্তি যে দেখায় তাকে মতলববাজ বলে ধরে নেওয়া যায়। তু: ১) Too much courtesy, too much craft, ২) তুলসীবনের বাঘ।

যদু দত্তর সর্বাঙ্গে তিলক, গলায় তুলসীকাঠের মালা। আর, দোকানে ঢোকামাত্র মধুর সম্ভাষণ। এ সবে ভুলো না, ভায়া। অতিভক্তি চোরের লক্ষণ, জান তো?

☐ **অতি ভালোও ভালো নয়** *(কোনো কিছুর বাড়াবাড়িই ভালো নয়)* — অতি ভালোও মন্দ ফল আনতে পারে। অতি যত্ন, অতি শাসন, অতি ভালোবাসা, অতি দর্প — সবকিছুরই বিরূপ প্রতিক্রিয়া আছে। তু: ১) অতি যত্ন অযত্নেরই মূল, ২) Too much of a good thing is good for nothing. ৩) অতি দর্পে হতা লঙ্কা।

অতি ভালোও ভালো নয়, বৌমা। তুমি যে ভাবে ছেলেটার খাওয়া পরা, লেখাপড়া নিয়ে সর্বদা শাসন করছ তাতে ছেলেটার ভালো না হয়ে মন্দই হবে।

☐ **অতি লোভে তাঁতি নষ্ট** - *(বেশি লোভ করলে ক্ষতি হয়)* — তাঁত বোনা এক তাঁতির অতি লোভের গল্পটি এইরূপ। মন্থর নামে এক তাঁতিকে এক বেতাল বর দিতে চাইলে স্ত্রীর পরামর্শে তাঁতি দেহের পশ্চাৎ দিকে আর একটি মাথা এবং একসঙ্গে দুখানা কাপড় বোনার জন্য অতিরিক্ত দুটি হাত প্রার্থনা করে। বরের প্রভাবে দুটি মাথা এবং চারটি হাত নিয়ে তাঁতি যখন গ্রামে ফেরে তখন গ্রামবাসীরা তাকে রাক্ষস ভেবে মেরে ফেলে। তু: ১) All covet all lost, ২) Grasp all. lose all, ৩) খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হল এঁড়ে গোরু কিনে।

গ্রামে বসে দ্বিজপদ ভালোই ব্যবসা করছিল। বেশি লাভের আশায় রামপুরহাটে ব্যাবসা করতে গিয়ে পুঁজি ফাঁক করে ফিরে এল। অতি লোভে তাঁতি নষ্ট আর কাকে বলে!

☐ **অথৈ জলে পড়া** *(ভীষণ বিপদে পড়া)* — থৈ অর্থে জলের তল ও কূল দুইই বোঝায়। থৈ পাওয়া — দ্রষ্টব্য। যেখানে জলের তল বা কাছাকাছি কোনো কূলের সন্ধান পাওয়া যায় না সেটিই অথৈ জল। এরূপ অবস্থায় পড়াকে অথৈ জলে পড়া অর্থাৎ ভীষণ বিপদে পড়া বলে। তু: অকূল পাথার।

এক পয়সা ক্ষতিপূরণ না দিয়ে কর্তৃপক্ষ যে ভাবে কোম্পানিটি উঠিয়ে দিলেন তাতে সমস্ত কর্মচারিই অথৈ জলে পড়েছেন।

☐ **অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণ** *(খাদ্যের অভাব বা অতি সঞ্চয়ীর সব হারানো)*— গল্পে দীর্ঘরাব নামে এক খাদ্যাভাবী ও ক্ষুধার্ত শেয়াল পথে মৃত ব্যাধ, সাপ, শূকর, মৃগ এবং একটা ধনুক — এই পাঁচটিকে পড়ে থাকতে দেখে। ঘরে খাদ্যাভাব থাকায় এতগুলো খাদ্যকে সে কীভাবে ক্রমান্বয়ে খাবে তার পরিকল্পনা করে। সে মনে মনে বলে —

মাসমেকং নরঃ যাতি, দ্বৌ মাসৌ মৃগশুকরৌ
অহিরেকং দিন যাতি অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ

অর্থাৎ মানুষটা দিয়ে একমাস, মৃগ ও শূকরে দুমাস, সাপটায় একদিন তার খাওয়ার কাজ চলে যাবে। আজ ধনুকটার গুণ আমার ভক্ষ্য হোক। এই বলে ধনুকটার গুণে কামড় দেওয়ামাত্র গুণ ছিঁড়ে যায় এবং জ্যা-মুক্ত ধনুকের আঘাতে দীর্ঘরাব মারা যায়।

মাথার টেরি এবং কাপড়ের কোঁচা দেখে কিন্তু সিরাজুল সাহেবের যে অদ্যভক্ষ্য ধনুর্গুণ অবস্থা তা বোঝা যাবে না।

☐ **অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট** *(কাজের তুলনায় লোক বেশি হলে কাজ পণ্ড হয়)*— চৈত্র মাসে গাজনতলায় বহু সন্ন্যাসীর ভিড় জমে। গাজন পালনের জন্য এক এক সন্ন্যাসী এক এক বিধান দেন এবং আপন আপন মতে অবিচল থাকেন। এদিকে কাজ করার চেয়ে উপদেশ দেওয়ার লোক বেশি হওয়ায় কোনো কাজই হয় না। লোক বেশি থাকলে কাজে ফাঁকি দেওয়ার সুযোগও বাড়ে। তু: ১) Too many cooks spoil the broth, ২) রাজার ঘরে হাজার ঢুলি কেউ বাজায় কেউ কাঠি দেয়।

ভাই, ভাগ্নে, ভাসুর আর ভাইপোকে কাজের ভার দিয়ে নন্দরানির অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়েছে। কেউ কোনো কাজ করেনি। ভাই ভেবেছে ভাগ্নে করবে, ভাগ্নে ভেবেছে ভাসুর করবে।

☐ **অধিকন্তু ন দোষায়** *(কমের পরিবর্তেএকটু বেশি ভালো)* — সব জিনিসেরই একটি ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা থাকে। সেই ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে হয়। তার থেকে বেশি হলে ক্ষতি হয় না কিন্তু কম হলে ত্রুটি ঘটে। বাগধারাটি অবশ্যই ভালো জিনিসের